হুমায়ুন আজাদের অপ্রকাশিত সাক্ষাতকার

ব্যাঙ্ককের বামরুনগ্রাদ হাসপাতাল। জনতার দাবিতে ড. হুমায়ুন আজাদকে এ হাসপাতালে সরকারী উদ্যোগে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছিল। এপ্রিলের ৫, ৬ ও ৭ তারিখে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভিডিওতে ধারণ করা হয় ড. আজাদের একটি দীর্ঘ সাক্ষাতকার। হাসপাতালে তাঁর কেবিন, বারান্দা, বাগানে হেঁটে ভিডিওতে ধারণ করা সেই সাক্ষাতকারে তখন মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসা দেশের প্রথাবিরোধী এ লেখক বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলেছেন। এসব কথায় প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ওপর মৌলবাদী হামলা, দেশজুড়ে মৌলবাদী অপশক্তির দাপট ও তাণ্ডবে তাঁর উদ্বেগ, ঘৃণা এবং বাংলাদেশ নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা-ভালবাসা ইত্যাদি। প্রায় তিনঘণ্টার সেই ভিডিও সাক্ষাতকারে তিনি যা বলেছিলেন তার পুরোটাই এখানে তুলে ধরা হলো–

ফজলুল বারী

এমন বাংলাদেশ চাই, যে বাংলাদেশ হবে রাজাকার ও মৌলবাদ মুক্ত

এ আমার ঘর। ব্যাংককের বামরুনগ্রাদ হাসপাতালের কক্ষ। মার্চের ২২ তারিখে আমি এখানে এসেছি। মৃত্যু থেকে ফিরে আসার পর এখানে এসেছি আমি। দ্বিতীয় জীবনে যদিও আমার বিশ্বাস নেই, তবু এটি আমার একটি নতুন জন্ম।

আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছে এ প্রকৃতি, মানুষ এবং হাসপাতাল। যে অন্ধকারে আমি পড়ে গিয়েছিলাম এবং অন্ধকার থেকে যারা আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে জীবনের আলোতে, তাদের কথা আমার মনে পড়ে। এখন আমার মনে পড়ে, আমি চিৎকার শুনেছি আমার ছাত্রদের। তারা চিৎকার করে বলছে, এ আমাদের হুমায়ুন আজ্‌াদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর! কাটা পাঙ্গাস মাছের মতো টেনে হিঁচড়ে আমাকে তোলা হচ্ছে পুলিশের গাড়িতে। তারপর হয়ত আমাকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে।

হঠাৎ ভিড়ের মাঝে আমি আমার এক মেয়েকে দেখি। আমি তাকে বলি, তুমি এখানে কি করে এলে। সে কিভাবে সেখানে এসেছে আমি জানি না। কিন্তু তখনও আমার চেতনা রয়েছে। আমার পকেট থেকে মানিব্যাগ, মোবাইল ফোন, ঘড়িটি খুলে আমি তার হাতে দেই। তারপর আর কিছু মনে নেই আমার।

আমি পরে শুনেছি সারা বাংলাদেশ এবং সারা পৃথিবীর বাঙালীরা আমার জন্য কেঁদে উঠেছে। তারা সবাই বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে আমাকে। এরপর আমি জেনেছি আমার জন্য কেঁদেছে বাংলাদেশের মানুষ, কেঁদেছে নিউইয়র্কে, জার্মানিতে এবং অস্ট্রেলিয়ায়।

শুনেছি সিএমএইচ-এর ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে যখন আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়, হাজার হাজার মানুষ তখন আমার খবর নিতে ছুটে গেছেন সেখানে। যাঁরা আমাকে দেখেছেন বা দেখেননি তাঁরা আমার একটা খবর শোনার জন্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করেছেন। রক্ত দিতে ব্যাকুল হয়েছেন।

আমি শুনেছি আমার জন্য, আমার বেঁচে থাকার জন্য অনেকটা আন্দোলন করেছে আমার সহকর্মী শিক্ষকরা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা, আমার পাঠক-অনুরাগীরা। এবং তাঁদের কথা যখন আমার মনে পড়ে তখন একটা প্রশ্ন জাগে মনে, তারা কেন আমাকে এভাবে ভালবেসেছিল?

দুই

আমি মৃত ছিলাম কয়েকদিন। আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের চিকিৎসকরা। সেখানকার যন্ত্রপাতিগুলো। এমনকি সেখানকার সহকারীরা। যারা আমাকে সেবা করেছে রাতদিন। মার্চ মাসের তিন তারিখ পর্যন্ত জানতাম না আমি পৃথিবীতে এসেছিলাম এবং পৃথিবীতে নেই।

আমি তাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ। তাদের নাম আমার হৃদয়ে আছে। অজস্র নাম, যেগুলো আমি এখন মনে করতে পারব না। সারা বাংলাদেশের এবং সারা পৃথিবীর অজস্র মানুষ আমার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। তাঁদের ভালবাসা, তাঁরা আমাকে জীবিত দেখতে চেয়েছিলেন। যাঁদের নাম মনে পড়ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, আমার সহকর্মী ড. ফায়েজ, আমাদের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আরেফিন সিদ্দিক এমন আরও অনেক অনেক নাম, যেগুলো আমি এখন মনে করতে পারছি না।

এবং সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল আমাকে নতুন করে প্রাণ দিয়েছে। সেখানকার চিকিৎসকদের বিস্ময়কর দক্ষতা, যন্ত্রপাতির দক্ষতা, এবং সেখানকার চিকিৎসা সহকারীরা যে রাতভর ছায়ার মতো বসে থেকেছে আমার পাশে। আমি শব্দ করলে তারা আমার পাশে দৌড়ে এসেছে। তারপর আমি আবার বেঁচে উঠেছি।

তারা আমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলেছে। যদিও আমার দেহের বিকৃতিকে তারা সম্পূর্ণ সারিয়ে তুলতে পারেনি। বিদেশে আমার চিকিৎসার জন্য দাবি জানিয়েছে আমার সহকর্মীরা, আমার অনুরাগীরা, আমার ছাত্রছাত্রীরা এবং আরও অনেকে। তারপর সরকার মনে করেছে আমাকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। তার জন্য আমি এখানে এসেছি। এবং এটি একটি অসাধারণ হাসপাতাল। এ হাসপাতাল শুধু বাঁচিয়ে রাখছে তা নয়, আমাকে আগের মতো করে তুলতে চেষ্টা করছে। যদিও সে চেষ্টা অনেকদিন ধরে করে যেতে হবে।

আমি ধন্যবাদ জানাই তাঁদের সবাইকে। যাঁরা আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। যাঁরা আমাকে দেশে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন এবং আজ এখানে পাঠিয়েছেন। আরও সুস্থভাবে জীবিত থাকার জন্য।

তিন

এ হাসপাতালে যখন আমি আসি তখন আমি বেশ বিস্মিত হয়ে পড়েছিলাম। কারণ এত বড় হাসপাতাল আমি এর আগে এডিনবরায় দেখেছিলাম। কিন্তু সেখানে চিকিৎসা নিতে যাইনি। এখানে আসার পর আমাকে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন চিকিৎসকরা। আমাকে মৃত্যু থেকে ফিরিয়ে এনেছে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল কিন্তু আমার দেহকে নানাভাবে বিকৃত করা হয়েছে। আমার মুখমণ্ডল আর আগের মতো নেই। কোন দাঁত নেই এখন আমার মুখের ভিতরে। এবং সেই আক্রমণের পর আমার শরীরে নানা ব্যাধি জন্ম নিয়েছিল। চিবুকের ভিতরে ধাতবের পাত ঢুকিয়ে সেটিকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেছেন সামরিক হাসপাতালের চিকিৎসকরা। আমার গালের ভিতরে তারা স্ক্রু লাগিয়েছে সেটি জোড়া দেবার জন্য। পঞ্চাশটির মতো সেলাই রয়েছে আমার মাথায়। সে সেলাইগুলো এখন অবশ্য দেখা যায় না।

একটা বেশ গভীর ক্ষত রয়েছে আমার ঘাড়ের পিছনে। সেই দৃশ্যের কথা আমার বিশেষ মনে নেই। তবে এখন মনে হয় যারা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল সম্ভবত তারা প্রথমে আমার গলার দিক থেকে কেটে ফেলতে চেয়েছিল। না পেরে আঘাত করেছে মুখে এবং মাথায়। আমি তো অদম্য মানুষ। সে জন্য তারা হয়ত সফল হতে পারেনি।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার–আমি পরে দেখেছি যে আমার হাত কাটেনি। বাহুর অংশ কেটেছে। আমার ধারণা আমি বইমেলা থেকে ফেরার সময় প্রতিদিন দুটি করে বই নিয়ে আসতাম। হয়ত আমি তখন বই দিয়ে ঘাতকদের আঘাত ফিরিয়েছি। সে জন্য আমার হাত কাটেনি। কিন্তু বাহুতে আঘাত লেগেছে।

আমি পরে আমার আহত অবস্থার ছবি দেখেছি। আমার মুখমণ্ডল থেকে ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে। রক্তাক্ত চিবুক আমি চেপে ধরে আছি। এমন হিংস্রতার মধ্যে আমি পড়েছিলাম। এমন হিংস্রতা বাংলাদেশে রয়েছে। আবার রয়েছে আমার অনুরাগীরা। যারা আমাকে কাছে থেকে ভালবাসতে জানে। দূর থেকে ভালবাসতে জানে।

এবং আমি এটা জেনে অশ্রুকাতর হয়ে উঠি মাঝে মাঝে। যে আমাকে বিপুল বিপুল পরিমাণ বাঙালী ভালবাসে। এবং তারা চায় আমি বেঁচে থাকি।

চার

মৌলবাদীরা হিংস্র মানুষ। তারা চায় না আমি বেঁচে থাকি। কিন্তু যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে, ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাস করে, যারা মানুষ বেঁচে থাকুক এটি চায়, তারা সবাই চেয়েছে আমি যাতে বেঁচে থাকি। এবং অনেকে বলেছেন আমার বেঁচে থাকাটা তাদের কাছে একটি প্রতীক হয়ে উঠেছে। যে প্রতিবাদ করে, যে বিদ্রোহ করে, সত্যের কথা বলে যে, সে বেঁচে থাকে। সে শুধু শহীদ হয়ে অমরত্ব লাভ করে না। যে জীবিত থেকে এক ধরনের প্রতীক হয়ে ওঠে।

আক্রান্ত হয়ে আমি যে যন্ত্রণা পেয়েছি তার কিছুই আমার মনে নেই। মৃত্যুর মধ্যে আমি কিভাবে বাস করেছি তা আমার মনে নেই। কারণ মৃত্যু এমন এক ব্যাপার, অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ, তার মধ্যে কোন অভিজ্ঞতা নেই। জীবনের মধ্যে অভিজ্ঞতা আছে। মৃত্যুর মধ্যে কোন অভিজ্ঞতা নেই। সেখান থেকে কোন অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসা যায় না। সেখানে শুধুই অন্ধকার।

আমি যখন আবার জেগে উঠেছি, পত্রিকায় প্রথম যখন দেখেছি আমার ছবি, আমি আমার সে ছবি চিনতে পারিনি। পত্রিকার প্রথম ছবিতে দেখেছি প্রধানমন্ত্রী আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। সাদা চুল আমার মাথায়। সাদা দাঁড়ির মতো কিছু একটা আমার মুখে। ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করেছি এগুলো কি? তাঁরা বলেছেন আপনার মাথায় আমরা কিছু তুলো লাগিয়ে দিয়েছিলাম। গালে যেহেতু বড় গর্ত হয়ে গিয়েছিল সেটি ঢেকে দেবার জন্য আমরা সেখানে দিয়েছিলাম তুলোর প্রলেপ।

আমাকে কখনও ওই দৃশ্যের মতো করে দেখতে চাইনি আমি। কখনও ভাবিনি এমন একটি ঘটনায় আমি এমন একটি দৃশ্যে পরিণত হব। আমার শুধু অপরাধ আমি বই লিখেছি এবং সত্য প্রকাশ করেছি।

পাঁচ

এখন আমি বেশ সুস্থ। তবে আমার মুখের সেই আগের আকৃতি নেই। দাঁত নেই আমার। আমি ঠিকমতো খেতে পারি না। এ হাসপাতালে আমার জন্য অনেক খাবার দেয়া হয়। কিন্তু সে সব আমি ঠিকমতো খেতে পারি না। অনেকে এখানে আমার জন্য ফুল নিয়ে এসেছেন। কিন্তু এখানে সবার আসাটা সহজ নয়। এ কক্ষটির জন্য নেয়া হয়েছে বিশেষ নিরাপত্তা। এখানে আসার পর নানা পরীক্ষা করা হয়েছে আমার। আমি তার সবক'টির নামও জানি না। আমার ক্যান্সার বা অন্য কোন ব্যাধি আছে কিনা। আমার রক্তচাপ আছে। কিন্তু সেটি বিশেষ মারাত্মক নয়।

আমার যে এখানে একেবারেই সমস্যা হচ্ছে না সেটিও নয়। যেমন আমি ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি না। তাতে মাথা ঘোরে। বিছানায় শুতে গেলে, শোয়ার থেকে ওঠার সময়েও মাথা ঘোরে। আমি অনেকক্ষণ এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াতেও পারি না। এ কাজগুলো আমার জন্য করে দিয়ে গেছে সেই হিংস্র মৌলবাদীরা। বাংলাদেশে তারা এখন এসবই করছে। বাংলাদেশকেও তারা আমার চেহারার চেয়েও বিকৃত করতে চায়। রুগ্ন, মৃত দেখতে চায় আমার থেকেও। সে কাজটিই তারা করে যাচ্ছে।

এখানেও আমি এক রকম বন্দী হয়ে আছি। ব্যাঙ্ককে আমি আগে কখনও আসিনি। এখন এ হাসপাতালের কক্ষ ছাড়া আমার আর কোথাও যাবার সুযোগ নেই। প্রতিদিন এখানে আমি বিকেলের জন্য অপেক্ষা করি। রোদ চলে গেলে আমি বারান্দায় গিয়ে বসি। সেখানে বসে চা খাই। সেখান থেকে দেখি ব্যাঙ্ককের আকাশ। আমার অতীত ভবিষ্যত নিয়ে ভাবি। কি বই ভবিষ্যতে লিখব আমি সে সব নিয়ে ভাবি।

পাঁচ

উনিশ শ তিরিশের দশকে আমার নানাও খুন হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে আমি দেখিনি। কিন্তু তিনি আমাদের মধ্যে কিংবদন্তি হয়ে আছেন। প্রচুর ধনসম্পদ করে অল্প বয়সেই খুন হয়ে গিয়েছিলেন আমার নানা। আমার গ্রাম, আমার নানার গ্রাম থেকে বহু লোকজন আমাকে দেখতে এসেছিলেন হাসপাতালে। আমার গ্রামের এক আত্মীয়া নাকি আমাকে দেখতে এসে চিৎকার করে বলেছিলেন তুইও জান খাঁর মতো গেলি। জান খাঁ আমার নানার নাম। আমার মনের মধ্যে গভীর দাগ কেটে আছে এই চিৎকার।

ছয়

ব্যাঙ্ককে আমার সঙ্গে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা আমার কাছে এ শহরের খুব প্রশংসা করেন। ব্যাঙ্ককের এটা ভাল সেটা ভাল। আমি তো সে সব দেখিনি। এখানে আসার পর সরাসরি আমাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। যাবার সময় এখান থেকেই সরাসরি যাব এয়াপোর্টে। ব্যাঙ্ককের সবকিছু পরিকল্পিত-সুশৃঙ্খল। এখানকার এমন ভাল নানা কিছু শুনে আমার খুব কষ্ট হয়। আমি নিহত হয়ে বেঁচে থাকার আশায় ব্যাঙ্কক এসেছি। কেন এমন সুন্দর হচ্ছে না আমার দেশ!

সাত

আমার বইগুলোর মধ্যে দুটি বইয়ের নাম বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যেন এগুলো মিলে গেছে আমার জীবনের সঙ্গে। যেমন আমার একটি উপন্যাসের নাম 'একটি খুনের স্বপ্ন'। যদিও ওই উপন্যাসের নায়ক কখনও খুন করে উঠতে পারেনি। সারাজীবন সে শুধু খুনের স্বপ্ন দেখেছে। এবং সে স্বপ্ন দেখে দেখে বেঁচেছে। আমার কবিতার বইয়ের নাম ছিল 'পেরোনোর কিছু নেই'। যেন আমি শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছি। এখন আর পেরোনোর কিছু নেই। এবং যেন ঘাতকেরাও আমাকে শেষ প্রান্তে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল।

যে উপন্যাসটির জন্য আমি নিহত হয়েছি বলা যায়, আমি তো বেঁচে উঠেছি নিহত হবার পর, সেটি 'পাক সার জমিন সাদ বাদ'। এটি বাংলাদেশের পরিস্থিতির সবচেয়ে শৈল্পিক উপস্থাপন। এ উপন্যাসটি যাঁরা পড়েছেন তাঁদের অনেকে বলেছেন এটি বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। মৌলবাদের হিংস্রতার যে রূপ এটি উপস্থাপন করেছে সেটি অতুলনীয়। অনেকে প্রশ্ন রেখেছেন এ উপন্যাসের পরিণতি এমন হলো কেন? এমন এক হিংস্র, পাষণ্ড নায়ক প্রেমে পড়ে কিভাবে মৌলবাদী খুনীদের আখড়া থেকে বেরিয়ে গেল। আমি তাদের বলেছি আমিও নানা রকম বিকল্প সমাপ্তির কথা ভেবেছি। কিন্তু নিষ্ঠুর সমাপ্তি আমার কাছে পছন্দ হয়নি। এই খুনীটি কিন্তু সেই মৌলবাদী ঘাতকদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী। সবচেয়ে শিক্ষিত। সে এক সময় সর্বহারায় ছিল। তারপর সাম্যবাদী ছিল। ব্যর্থতা তাকে মৌলবাদে নিয়ে এসেছে। এবং তাকে মৌলবাদে নিয়ে এসেছে প্রেমহীনতা।

তারপর এক রাতে সে যখন প্রেমিকাকে নিয়ে মৌলবাদী খুনীদের আখড়া থেকে পালিয়ে দূর বহু দূরের এক সমুদ্রের পারে গিয়ে দাঁড়াল, তার গাড়ি থামল, তখন সেই সমুদ্রের ভিতর থেকে সবুজের মাঝখানে একটি লাল সূর্য ওঠে। এটি একটি প্রতীকী ব্যাপার যে, বাংলাদেশের পতাকার ভিতরে লাল সূর্য রয়েছে। যে বাংলাদেশ আর মৌলবাদে আক্রান্ত হয় না। বাংলাদেশ মৌলবাদী সন্ত্রাসী খুনীদের দ্বারা আক্রান্ত হবে না। বাংলাদেশ কখনও হবে না আফগানিস্তান।

আট

আমি যে আজ বেঁচে আছি তার পিছনে আছে বাংলাদেশের মানুষ। তাদের আবেগ জেগে উঠেছিল। তারা চেয়েছে আমি বেঁচে থাকি। কাজেই সমগ্র বাঙালী জাতির কাছে আমি ঋণী। তাদের অজস্রবার ধন্যবাদ জানালেও আমার ঋণ শোধ হবে না।

প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগ নিয়েছিলেন, আমাকে দেখতে এসেছিলেন। রাষ্ট্রপতি উদ্যোগ নিয়েছিলেন, আমাকে দেখতে এসেছিলেন। যে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমি এক সময় ঘনিষ্ঠ ছিলাম। আমরা এক সঙ্গে আন্দোলন করেছি। এবং বিরোধী দলের নেত্রী তিনি কয়েক কিলোমিটার হেঁটে এসেও আমাকে দেখতে পারেননি। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটসহ অনেক সংগঠনের নেতাকর্মীরা আমার জন্য উদ্বিগ্ন বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন। আমার অনুরাগী রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মীরা আমার জন্য হাহাকার করেছেন। শুনেছি চারুকলার ছাত্রছাত্রীরা আমার জন্য রাস্তায় ছবি এঁকেছেন। দেশ যে জংলী হয়ে উঠেছে সেটি তাঁরা তুলে ধরেছেন তাঁদের ছবিতে। আমার সহকর্মীরা উপাচার্য ড. ফায়েজ, আরেফিন সিদ্দিক তাঁরা আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যে তাঁদের সঙ্গ আমি আরও কিছুকাল লাভ করব।

নয়

এগুলো আমার জন্য খুবই আনন্দদায়ক। কারণ মৃত্যু কোন আনন্দের ব্যাপার নয়। মৃত্যু নিতান্ত অন্ধকার। মৃত্যুর কোন অভিজ্ঞতা নেই। আমি যে কয়েকদিন নিহত, মৃত ছিলাম, সে ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞতা আমার নেই। শুধু মনে পড়ে যেন আমি একটি খাটের ওপর শুয়ে আছি, আমাকে যেন বন্দী করে রাখা হয়েছে, আমার হাত বাঁধা, পা বাঁধা এবং আমি কিছুতেই হাত তুলতে পারছি না, পা তুলতে পারছি না। কিন্তু জ্ঞান ফেরার পর দেখি আমার হাতে বা পায়ে কোন শিকল নেই। এই অনুভূতিটাই শুধু কয়েকদিন ধরে আমার রয়েছে।

তারপর এক সময় জেগে উঠে আমি জেনেছি আমি বেঁচে আছি এবং আমি অনেকের কাছে ঋণী হয়ে আছি।

দশ

আমি এর আগে এমন বন্দী জীবন যাপন করিনি। ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত আমি বন্দী জীবন যাপন করছি। এখনও অনেক কিছু মনের মধ্যে বন্দী। সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে একটি কক্ষে থেকেছি। তারপর আরেকটি কক্ষে গেছি। এ হাসপাতালে এসে একটি কক্ষেই আমার জীবন কেটেছে। মাঝে মাঝে তারা আমাকে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যই শুধু বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যায়। আজ যে এই ব্যাঙ্ককের হাসপাতালের বাগানে ফুলের ঘ্রাণ নিতে পারছি এটি আমার জন্য প্রকৃতির অসামান্য উপহার। যে প্রকৃতির মানুষ আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

এখানকার সব কিছুই পরিকল্পিত। এসব দেখে দেখে আমার মন বেদনার্ত হয়। আমার দেশের সবকিছু বড় অপরিকল্পিত। তার পথ অপরিকল্পিত। তার রাজনীতি অপরিকল্পিত। এবং তার সমস্ত কর্মকাণ্ড অপরিকল্পিত।

এগারো

বার বার মনে পড়ে আবার কবিতা লিখব, আবার উপন্যাস লিখব। সমালোচনা লিখব এবং আমার মৃত্যুর আগে-পরের ঘটনাগুলো লিখব। পৃথিবীতে সেই প্রাচীনকাল থেকে কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এঁরা অন্ধদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে প্রাচীনকালে মধ্যযুগে তাঁরা প্রাণ দিয়েছেন মৌলবাদীদের হাতে। তবে তাঁদের অনেকে পরিকল্পিত নয় আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হয়েছিল হিটলারের জার্মানিতে এবং আমাদের বাংলাদেশে। পরিকল্পিতভাবে আমাদের কবি, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা

হয়েছিল ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের ১৪ তারিখে। সেই হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছিল যে রাজাকার-আলবদররা সেই রাজাকার আলবদররাই আবার স্বাধীন বাংলাদেশে আমাকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যার উদ্যোগ নিয়েছিল। আমি সম্ভবত স্বাধীন বাংলাদেশে সেই রাজাকার-আলবদর, মৌলবাদীদের প্রথম সুপরিকল্পিত শিকার। তবে তারা ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতা নিশ্চয়ই তাদের খুবই আহত করেছে। তারা হয়ত আবার পরিকল্পনা নিচ্ছে আমাকে কিভাবে নিশ্চুপ করে দেয়া যায়। কি করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া যায়।

বারো

আমার দেশকে আমি ভালবাসি। আমার ভাষাকে আমি ভালবাসি। আমি উদ্বাস্তু হয়ে দেশে দেশে ঘুরতে চাই না। আমি চাই না আমি দেশ ছেড়ে চলে যাই। এবং বিদেশে অত্যন্ত সম্মানিত পুরস্কৃত উদ্বাস্তু লেখক হিসাবে থাকতে চাই না। আমি বাঁচব আমার নিজের দেশে। বাংলাদেশে। এবং এমন একটি বাংলাদেশ আমি চাই, যে বাংলাদেশ হবে রাজাকার মুক্ত, মৌলবাদ মুক্ত। আমি বাংলাদেশের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলকে আবেদন জানাই। তারা যেন বাংলাদেশ থেকে মৌলবাদকে সম্পূর্ণ রূপে উৎখাত করে। মৌলবাদের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নয়।

তেরো

কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি এখন মৌলবাদী হয়ে উঠেছে। সকালে টেলিভিশন খুললেই দেখা যায় ধর্মের নামে প্রায় দু'ঘণ্টা মৌলবাদ প্রচার। ধর্ম নিয়ে টেলিভিশনগুলো কিছুটা সময় আলোচনা করতে পারে। কিন্তু সেই মৌলবাদী খুনী যারা একাত্তরে ধর্মের নামে খুন করেছিল তাদের প্রচার টিভি চ্যানেলগুলো কেন করবে! এই লোকগুলো ধর্মীয় কথাবার্তার নামে মৌলবাদকে, তালেবানী ধ্যানধারণার প্রচার করে। এরা দেশের সমস্ত মেধা-প্রতিভাকে হত্যা করতে চায়। তারা দেশকে মধ্যযুগে ফিরিয়ে নিতে চায়। কাজেই এই মৌলবাদী সম্প্রচার অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত আমাদের রাষ্ট্রের। ধর্মের বাণীগুলো মানুষকে জানাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু টেলিভিশনের মাধ্যমে মৌলবাদী রাজনীতির আদর্শের প্রচার বন্ধ করতে হবে।

চৌদ্দ

আমাদের দেশটা এমন মৌলবাদী ছিল না। কিন্তু মৌলবাদ এখানে এখন প্রবল হয়ে উঠেছে। আমার জীবন লাভ যদি কোন তাৎপর্য বহন করে তাহলে সেই তাৎপর্য হবে এই মৌলবাদকে বাংলাদেশ থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা। মৌলবাদী কারও স্থান হবে না বাংলাদেশে। আমাদের রাষ্ট্রে মৌলবাদী খুনীরা এখন মন্ত্রী হয়ে আছে। তাদেরকে ওই স্থান থেকে বিতাড়িত করতে হবে। এবং তারা বিতাড়িত হবে।

আমাকে মাঝে মাঝে লোকজন জিজ্ঞেস করে আপনি কি জানেন কে আপনাকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়েছে। আপনার কি তার মুখ বা তাদের মুখ মনে আছে? তা আমার মনে নেই। কিন্তু আমার মনে আছে আমাকে একজন বা দু'জন ব্যক্তি খুন করার জন্য এসেছিল, তাদের নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু আমাকে খুন করতে চেয়েছে বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তি।

মৌলবাদীদের কাহিনী আমি 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' উপন্যাসে লিখেছি। একজন সংসদ সদস্য, যিনি নির্বাচিত না হয়েও নির্বাচিত হন বলে আমরা শুনেছি, যিনি নানা জায়গায় তফসির করে ধর্মের নামে অজস্র মিথ্যা কথা বলেন, যিনি এভাবে অজস্র টাকা উপার্জন করেন, তিনি সংসদে আমার বিরুদ্ধে অশালীন বক্তব্য রেখেছেন। ব্লাসফেমি আইন করার জন্য আবেদন করেছেন। তিনি এবং তাঁর দল এ হত্যা চেষ্টার পিছনে রয়েছে।

এবং আমি এখানে থাকা অবস্থায় শুনেছি যে পল্টনে নাকি এই মৌলবাদীরা একটি বিশাল জনসভা করেছে এবং তাদের লক্ষ্যই হচ্ছে আমাকে এবং আমার বইটিকে আক্রমণ করা। একজন বলেছে এটি অশ্লীল। একজন বলেছে এটি ধর্মবিরোধী। এবং তারাও এখন বুঝতে পারছে আমাকে হত্যা করতে যেয়ে তারাও এখন বিপদগ্রস্ত। নিজেদের রক্ষা করার জন্য তাদের এখন পল্টনে যেতে হচ্ছে এবং নানা রকম অশ্লীল কথা বলতে হচ্ছে। এবং যারা সেখানে বক্তৃতা দিচ্ছে সেই মৌলবাদী শক্তি, যারা মন্ত্রী হয়েছে যারা সংসদে গেছে তাদের পক্ষে আমার বই পড়ে বোঝা সম্ভব নয়। 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' পড়েও বোঝা সম্ভব নয়। তারা বোঝে কোথায় তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হলো।

আমি এ বইতে অকপটে তাদের নির্মমতা, তাদের অত্যন্ত কুৎসিত জীবনের কাহিনী, তাদের নির্মমতার কাহিনী উপস্থাপন করেছি। এভাবে আর কোথাও হয়নি। এভাবে আর বাংলা সাহিত্য কেন বিশ্বসাহিত্যেও কোথাও মৌলবাদকে উপস্থাপন করা হয়নি। মৌলবাদকে তত্ত্ব হিসাবে নয়, বাস্তব, অশ্লীল একটি শক্তি হিসাবে যেভাবে দেখা দরকার আমি আমার বইতে সেভাবেই দেখিয়েছি। এটিই তাদেরকে অত্যন্ত পীড়িত করেছে। কারণ তাদের বাহিনীর সমস্ত জোব্বা, আলখেল্লা, বড় বড় দাড়ি, মেহেদি মাখা দাড়ি যাই থাক না কেন ভিতরে তারা খুনী। ভিতরে তারা অশিক্ষিত, মূর্খ, ভণ্ড, বর্বর। এবং তারা প্রত্যেকেই খুনী।

পনেরো

আমাদের দেশ অবশ্য এখন খুনীতে ভরে উঠেছে। আমাদের দেশের সমস্ত গ্রামে, আমাদের শহরের সমস্ত পাড়ায় এখন খুনীদের প্রাধান্য। এই খুনীরা স্তরে স্তরে উপনীত হয়ে এমন কি মন্ত্রিত্ব পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করার মতো। এবং আমাকে খুন করার পিছনে অনেকটা এরাই রয়েছে মনে হয়। মৌলবাদী শক্তিটি কাজ করেছে।

ষোলো

দেশের কোথাও এখন শান্তি নেই। আমি তো এখনও বেঁচে আছি। আমার মৃত্যু হবার পর এরমাঝে দেড় মাসের মতো কেটে গেছে। এর মাঝে বাংলাদেশে অন্তত জবাই হয়েছে দু'হাজার মানুষ। দু'হাজার বা চার হাজার নারী ধর্ষিত হয়েছে। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে, এই পচে যাওয়া রাষ্ট্রকে, এই খুনী রাষ্ট্রকে আমাদের উদ্ধার করা দরকার। আমরা সুস্থ রাষ্ট্র দেখতে চাই। আমরা শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দেখতে চাই। এবং আমরা রাষ্ট্রের হাতে কোন চাপাতি দেখতে চাই না। আমরা রাষ্ট্রের হাতে কল্যাণ দেখতে চাই।

সতেরো

সংবাদ মাধ্যমগুলো , প্রচার মাধ্যমগুলো আমাকে কমবেশি ভালবাসে। তারা আমার প্রচুর সাক্ষাতকার প্রকাশ করেছে। এবং আমি শুনেছি এই সাতাশ তারিখের পর আমাদের তিনটি টেলিভিশন চ্যানেল–চ্যানেল আই, এনটিভি এবং এটিএন ধারাবাহিকভাবে বার বার আমার সংবাদ প্রচার করেছে। এবং জনগণের হৃদয়কে আরও আন্দোলিত করে তুলেছে। আমার বেঁচে থাকার পিছনে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে তারা। এবং দৈনিক পত্রিকাগুলো যার কয়েকটি পরে আমি দেখেছি, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, প্রায় সমস্ত পত্রিকা আমার জন্য প্রকাশ করেছে দীর্ঘ সংবাদ। এখনও প্রকাশ করে চলেছে। এবং আমি জানি ভবিষ্যতেও তারা প্রকাশ করবে।

এবং তারা যে আমাকে ভালবেসেছে, তারা যে আমাকে জীবিত রাখার জন্য, আমাকে এ পৃথিবীর আলোবাতাসের মধ্যে রাখার জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করেছে এরজন্য আমি তাদের সবার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। এবং শুধু বাংলাদেশে নয় নিউইয়র্কে আমাকে নিয়ে প্রথম একটি টেলিগ্রাম বেরিয়েছে। বাংলাদেশের সংবাদপত্র, টেলিভিশন চ্যানেলগুলো সম্ভবত এর আগে কোন ঘটনাকে এতটা গুরুত্ব দিয়ে ভালবেসে প্রচার করেনি। আমি তাদের কথা ভাবি। তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

তাদের বলছি আমি বেঁচে আছি। মৃত্যুর পর আমি আবার বেঁচে উঠেছি।

আঠারো

ছাপ্পান্ন বছর পেরিয়ে সাতান্নতে পা দিয়েছি আমি। ২৮ এপ্রিল তথা ১৪ বৈশাখ আমার জন্ম। আমি এ জীবনে ছাপ্পান্ন বছর বয়সে থেমে যেতে চাইনি। মরে যেতে চাইনি। আমি অন্তত আশিটা বছর বেঁচে থাকতে চাই। কিন্তু ঘাতকরা তা চায় না। আমি এই সময়ের মধ্যে সম্ভবত পঁয়ষট্টি বা সত্তরটি বই লিখেছি। আমার বইগুলোর কোনটি বেশ সহজ সরল, আকারে বড়, কোনটা বা জটিল, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কিশোর সাহিত্য, রাজনৈতিক ভাষ্য এমন নানা শাখায় আমি লিখেছি। সমকালীন বাংলাদেশে হয়ত এমন সব শাখায় এভাবে কেউ লেখেননি।

উনিশ

কিন্তু আমি কি এই বাংলাদেশের জন্য বেশি প্রয়োজনীয়? না নিজামী, এই সাঈদীরা বেশি প্রয়োজনীয়? এই মৌলবাদীরা বেশি প্রয়োজনীয়? আমার ধারণা যখন এই সাঈদী নিজামী, গোলাম আজম কবরে ঘোর আজাবে থাকবে, যখন অজগরসহ নানা কিছুর তারা আহার হবে, তখনও আমার নাম বাংলাদেশের সঙ্গে থাকবে। আমার নাম বোধহয় মুছে ফেলা খুব সহজ হবে না। কিন্তু সাঈদীদের নাম খুবই অল্পদিনের মধ্যে কতগুলো নষ্ট মানুষ হিসাবে মুছে যাবে। ঘাতক হিসাবে ছাড়া কেউ তাদের নাম মুখে নেবে না।

আমি মরে যেতে চাই না। আমার বাঁচার অসামান্য বাসনাই হয়ত আমার বেঁচে থাকার একটি কারণ। এবং আমি একজন অথর্ব মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকতে চাই না। আমার যদিও মুখমণ্ডল এখন অনেকটা বিধ্বস্ত, কিন্তু আমার সৌভাগ্য যে আমার মগজ নষ্ট হয়ে যায়নি। তা হতে পারত। আমার চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারত। তা হয়নি। আরও একটি বেশি যদি ঘাতকের চাপাতি ঠুকত আমার মগজে, মাথার ভিতরে, তাহলে হয়ত আমি বাঁচতামই না।

কুড়ি

আমি আবার লিখব। লেখাই হচ্ছে আমার জীবন। লেখাই হচ্ছে আমার আনন্দ। এবং আমি যে প্রগতিশীলতার কথা বলি, লিখি আমার সমস্ত কিছুর মধ্যে মানুষের স্বাধীনতা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, মানুষের কল্যাণ, মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, অধিকার, এবং সব সময়ে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অবস্থান এবং শিল্প করার, শিল্প সৃষ্টি করার চেষ্টা এগুলো ছিল এবং

থাকবে। আমার রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলোকেও আমি সব সময় শিল্পসম্মত করার চেষ্টা করেছি। এগুলো এতদিন অনেকেই বুঝেছেন। এখন বোধহয় এসব বিষয় আরও গভীরভাবে আলোচনা-পর্যালোচনা করা উচিত। আমি কি লিখেছি এবং কি লিখতে চেয়েছি।

আমি যদি আরও তিরিশ বছর বেঁচে থাকি, তাতে যদি আমি আরও সাতটি বই লিখি, সেগুলো হয়ত বিশিষ্ট ধরনের হবে, তাতে বক্তব্য বা কাহিনী বা আবেগ, স্বপ্ন এসব নানা কিছু প্রকাশ পাবে। সেগুলো বাঙালীকে বিকশিত করবে। এবং আমার আগের বইগুলো কি বাঙালীকে বিকশিত হতে সাহায্য করেনি। যে ধর্মান্ধ, মৌলবাদী গোষ্ঠী যারা বিভিন্ন রকমের ওয়াজ এবং জিকির করে ধর্মভীরু মানুষের টাকা অনেকটা ছিনতাই করে, তাদের কোন কাজ জনগণের কোন কল্যাণে আসেনি। কিন্তু আমার কাজ সম্ভবত দেশের মানুষের কল্যাণে এসেছে এবং আরও বহু বছর তা কল্যাণে আসবে দেশের মানুষের।

একুশ

বাংলাদেশ আমার প্রিয়। এ ভূখণ্ডে আমি জন্মেছি। বাংলা ভাষা আমার দ্বিতীয় মাতৃভূমির মতো। আমি বিদেশে জীবনযাপন করতে চাইনি। সেই ১৯৭৩ সালে আমি পড়তে বিদেশে গিয়েছিলাম। আমি চাইলে তখন সেখানে থেকে যেতে পারতাম। কিন্তু আমি তা চাইনি। আমি চেয়েছি আমার নিজের দেশে, নিজের ভাষার মধ্যে, নিজের মানুষের মধ্যে বসবাস করতে। আমি পরিশ্রমের ব্যাপারে কখনও কোন ত্রুটি করিনি। কখনও আমি অলস জীবন কাটাইনি। কখনও আমি মনে করিনি যে আমার কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে।

বাইশ

এবং আরও একটি বিষয় হলো আমি কখনও ক্ষমতাসীন রাজনীতির দিকে নতজানু হইনি। এবং তাদের কাছ থেকে কিছুই আমি পেতে চাইনি। আমার থেকে তুচ্ছরা কত কিছু পেয়েছে। কত কিছু পেয়ে ধন্য হয়েছে! তাদের গলাভরা মালা। তাদের মাথাভরা মুকুট। কিন্তু আমি কিছু চাইনি এবং আমাকে দেয়ার মতো যোগ্যতা বাংলাদেশের সরকারগুলোর বিশেষ নেই।

তেইশ

তবে আমি এখন আনন্দিত যে আমি বেঁচে আছি। যদিও অনেকে এখন আমাকে বলছে পরামর্শ দিচ্ছে বিদেশে থেকে যাবার জন্য। দেশে না ফেরার জন্য। কারণ ওই কসাইখানায় ফেরা আবার আমার জবাই হবার জন্য হতে পারে। এ আতঙ্ক অনেকের মধ্যে আছে। কিন্তু আমি আমার দেশটিতে ফিরে যেতে চাই। তার পথে প্রান্তরে, সবুজের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে চাই।

চব্বিশ

আমি বন্দী হয়ে থাকতে চাই না। কোথায় কোন মৌলবাদী ঘাতক ওঁৎ পেতে আছে, কোথায় সে চাপাতি ধারাচ্ছে, কোথায় সে তলোয়ার বা রিভলবার নিয়ে বসে আছে, এগুলো আমাকে ভীত করবে, কিন্তু সেগুলোকে আমি অত গুরুত্বপূর্ণ ভাবব না। এবং আমি দ্বিধাহীনভাবে যে সত্য প্রকাশ করেছি, আমাকে অনেকে বলেছেন আপনি খুব সাহসী, কিন্তু আমি বলতাম আমি কখনও সাহসী নই। আমি আঠারোতলা দালান থেকে লাফ দেই না। আমি কখনও বন্দুকের গুলির সামনে গিয়ে দাঁড়াই না। আমি সত্য প্রকাশ করি। যে দেশে সত্য প্রকাশ করাই সাহসের পরিচায়ক সে দেশ যে কি শোচনীয় পর্যায়ে নেমে গেছে, সেটা আমাদের বোঝা উচিত।

পঁচিশ

আমি একটি সুস্থ, কল্যাণে পরিপূর্ণ বাংলাদেশ চাই। এবং এই দায়িত্ব রাজনীতিবিদদের। কিন্তু রাজনীতিবিদরা এত বেশি পচে গেছে, এত বেশি নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের কোন আদর্শ নেই, কোন সততা নেই, দেশের প্রতি কোন ভালবাসা নেই, তারা শুধু অবৈধ অর্থোপার্জন করছে। এবং কতগুলো ঘাতক লালনপালন করছে। এই জন্যই বাংলাদেশের এই শোচনীয় অবস্থা। বিশ্বে বাংলাদেশ আজ বেশ কলঙ্কিত। বার বার দুর্নীতিতে প্রথম হয়েছে। অনেকে এখন বলছেন বাংলাদেশ এখন এশিয়ার লজ্জা। এবং তাঁরা বলছেন, এই লজ্জা, কলঙ্ক যারা বাড়িয়েছে সেই সাঈদী, নিজামী, গোলাম আযমরা, তাদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে।

শেষ

তার পরও আমি শীঘ্রই দেশে ফিরে যাব। আমি জানি না দেশে ফিরে যাবার পর দেশে আমি কি পরিস্থিতির মধ্যে পড়ব। হয়ত দিনের পর দিন হরতাল চলতে থাকবে। হয়ত চলতে থাকবে খুনের পর খুন। কিন্তু সেই রক্তাক্ত, বিপর্যস্ত, পচনশীল বাংলাদেশেই আমি বাস করতে চাই। সেখানেই আমি ফিরে যেতে চাই। সে যে আমারই দেশ।

(ড. হুমায়ুন আজাদ তখন দেশে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে নতুন মৌলবাদী হামলার হুমকি একদিনের জন্যও থামেনি। অতঃপর তিনি চলে গিয়েছিলেন জার্মানি। সেখান থেকে ফিরবে তাঁর প্রাণহীন কফিন)।

গোপালগঞ্জে এসব হচ্ছেটা কি?

নির্মল সেন

আমি ভাবিনি গোপালগঞ্জ নিয়ে আবার লিখতে হবে। গোপালগঞ্জ নিয়ে অনেক লিখেছি। লিখেছি রাস্তাঘাট, সেতু ও মানুষের দুরবস্থার কথা নিয়ে। সে লেখার পর ক'দিন যেতে না যেতেই শুরু হলো বন্যা। সারা দেশের মতো গোপালগঞ্জেও বন্যা হয়েছে। তাই বন্যার কথা ভাবছিলাম। বন্যায় তো গোপালগঞ্জে কেউ ত্রাণ নিয়ে যাবে না। কেউ দেখবে না গোপালগঞ্জের মানুষের দুর্ভোগের চিত্র। কেউ জানবে না গোপালগঞ্জের দুর্দশার কাহিনী। বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর যোগাযাগমন্ত্রী নাজমুল হুদা বলেছেন– আওয়ামী লীগ আমলে গোপালগঞ্জে অনেক কিছু হয়েছে। সুতরাং গোপালগঞ্জে এখন আর কোন কাজ নয়। আমি অবাক হয়েছি নাজমুল হুদার কথা শুনে। এর কিছু দিন পর আমি লিখলাম। আমার লেখার পর নাকি কিছু রাস্তার কাজ চালু হয়েছে।

এবার বন্যার কারণে আর একটি নতুন ছবি দেখা দিয়েছে। আমার বাড়ি কোটালীপাড়া। সেই কোটালীপাড়া-ঢাকা সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এবারের বন্যায় ঢাকা-রাজৈর সড়কের খেজুরবাড়ী ব্রিজ ভেঙ্গে গেছে। আরও কয়েকটি সেতু ঝুঁকিপূর্ণ। তাই মাসখানেক হলো ঢাকা-কোটালীপাড়া সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

এমন সময় গোপালগঞ্জের একটি খবর এলো। পুলিশের গুলিতে ছাত্রলীগ নেতা তুষার নিহত। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত ৬০, গুলিবিদ্ধ ২০। আমি তো অবাক! গোপালগঞ্জে আবার এমন কি হলো যে পুলিশকে গুলি করতে হবে? গুলি করে মানুষকে খুন করতে হবে? শেষ পর্যন্ত বুঝলাম এ দুঃখজনক গুলিবর্ষণ অতীত রাজনীতির অবশ্যম্ভাবী ফল। সেই আওয়ামী লীগ-বিএনপি সংঘর্ষের জের আজও চলছে। এবার সংঘর্ষ হচ্ছে পরিবহন নেতৃত্বের দখল নিয়ে। কে পরিবহন নেতৃত্ব দখল করবে। এই দখলের সংগ্রামে হরতাল হয়েছে। ধর্মঘট হয়েছে। গোপালগঞ্জের মানুষ ঢাকা আসতে পারেনি। ঢাকা থেকে মানুষ গোপালগঞ্জ যেতে পারেনি। সর্বত্রই নৈরাজ্য। মার মার কাট কাট অবস্থা। কোন কিছু হলেই পরিবহন ধর্মঘট হয়। বাসযাত্রীরা নাজেহাল হয়। যাত্রীদের দুর্ভোগের সীমা থাকে না। সে দৃশ্য দেখে মালিকেরা হাসে। দুই হাতে টাকা কুড়ায়। জানা গেছে, সেই মালিক পক্ষই বর্তমান গোলমালের মূল হোতা। ইতোপূর্বে গোপালগঞ্জের সব পরিবহন নেতৃত্ব ছিল আওয়ামী লীগের হাতে। বিএনপির তেমন কেউ ছিল না। বিএনপি ক্ষমতায় এলো। এমন সময় নেতৃত্বে এলেন বিএনপির এমএইচ খান মঞ্জু। তিনি নতুন নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করলেন। সমস্ত পরিবহন নেতৃত্ব তাঁর চাই। তাহলে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বকে হটাতে হবে। তাই স্বাভাবিকভাবেই গণ্ডগোল দেখা দিল। খবরে প্রকাশ-'গোপালগঞ্জের বাস শ্রমিকদের অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত। মোটর শ্রমিক সংগঠনের কর্তৃত্ব নিয়ে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি শ্রমিকদের এখানে বেশ কিছুদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। পরিবহন খাত থেকে জেলা বিএনপির সভাপতি চাঁদাবাজি বন্ধের দাবিতে মোটর শ্রমিকরা শনিবার (৩১ জুলাই) থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করে। বিএনপি সমর্থিত শ্রমিকরা এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে সকাল সাড়ে ৭টার দিকে গাড়ি চালানোর চেষ্টা চালালে প্রথমে উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাতাতি হয়। পরে সে সংঘর্ষ রূপ নেয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে। সকাল থেকে দফায় দফায় সংঘর্ষে জড়িয়ে পুলিশ বৃষ্টির মতো গুলি এবং অন্তত ২০ রাউন্ড টিয়ারগ্যাস ছোড়ে। ছাত্রলীগের একদল নেতাকর্মী ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনে যোগ দিলে দ্বন্দ্ব শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে। পুলিশ শর্টগানে গুলি ছুড়লে ঘটনাস্থলে গুলিবিদ্ধ হন ছাত্রলীগের জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক গাজী হাফিজুর রহমান লিকু, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আলম সিদ্দিকী, মোহাম্মদ উল্লাহ সুমন। মুহূর্তে ঘটনার খবর শহরময় ছড়িয়ে পড়লে ক্ষুব্ধ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা জমায়েত হয় স্থানীয় চৌরঙ্গী চত্বরে। পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ারগ্যাস ছোড়া শুরু করলে সূত্রপাত ঘটে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের। এরপর পুলিশের বৃষ্টির মতো গুলি ছোড়া বাড়ে। সকাল পৌনে ১০টার দিকে চৌরঙ্গীর জনতা ব্যাংকের সামনে লুটিয়ে পড়েন গুলিবিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা রাকিব হোসেন তুষার। ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন' (১ আগস্ট ২০০৪ দৈনিক জনকণ্ঠ)। এ খবরটি শুনে আমি অবাক হয়েছি। পুলিশ বলেছে সুমন তাদের গুলিতে নিহত হয়নি। আমার কথা এখানেই। ছাত্রলীগের ছেলেরা তো অস্ত্র নিয়ে মাঠে নামেনি। আর যদি পুলিশও গুলি না করে থাকে তাহলে তুষার মরল কার গুলিতে? প্রশাসন কিছু বলবে কি এ ব্যাপারে?

এ ঘটনার পর থেকে গোপালগঞ্জ ছিল উত্তাল। বিক্ষোভ ও দোকানপাট ভাংচুর হয়েছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে হরতাল হয়েছে। এ যাবত প্রায় ৪শ' জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। আর একটি মজার কাহিনী ঘটেছে পুলিশের মামলায়। যে পুলিশের গুলিতে তুষার মারা গেল সেই তুষারকে আসামী করেই পুলিশ আবার মামলা করল থানায়। কি অদ্ভুত প্রশাসন। তবে এখানে গোপালগঞ্জের দোকানদারা এক অভূতপূর্ব প্রতিবাদ করেছেন। পুলিশের কাছে কেউ কোন জিনিস বিক্রি করেননি। সেই থেকে আজ পর্যন্ত গোপালগঞ্জের অবস্থা স্বাভাবিক হয়নি। গোপালগঞ্জের প্রশাসন এখন কার হাতে জানি না। তবে জানি যে, প্রশাসন তার লয়ে চলছে না। আগেই শুনছিলাম এমএইচ খান মঞ্জু সব বাস টার্মিনাল দখলের

চেষ্টা করছে। এর প্রমাণও মিলেছে। কোটালীপাড়ার বাসস্ট্যান্ড দখল নিয়ে মঞ্জু সমর্থিত বিএনপি গ্রুপ ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত কামাল গ্রুপের সংঘর্ষ হয়েছে। সে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে প্রায় ৫০/৬০ জন আহত হয়েছে। এ ঘটনার আগে কোটালীপাড়া-ঢাকা বিআরটিসি বাস বন্ধ করা হয়েছে। বেসরকারী বাস মালিকদের সুবিধা হয়েছে। যাত্রীদের দুর্ভোগের পরিমাণ আরও বেড়েছে। বন্যায় ব্রিজ ভেঙ্গে যাওয়ায় ঢাকা-কোটালীপাড়া সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় যাত্রীদের দুর্ভোগের অন্ত নেই। আর এ দুর্ভোগ দেখারও কেউ নেই। ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তায় চলতে হয় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে? এভাবে আর কত দিন কোটালীপাড়ার মানুষ ঝুঁকি নিয়ে চলবে? স্থানীয় প্রশাসন ও সরকারের পক্ষ থেকে এর সমাধান হবে–এমন বিশ্বাস আমার নেই। কারণ এ সরকারকে আমি চিনি। এবং ভাল করেই চিনি।

তবে গোপালগঞ্জে যে এমন একটি রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটবে তা মনে হচ্ছিল কোটালীপাড়া বাসস্ট্যান্ড দখল নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর। কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটি তেমন গুরুত্ব দেয়নি। তাই যা হবার তাই হয়েছে।

সব মিলিয়ে গোপালগঞ্জের পরিস্থিতি যে খারাপ তা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করবেন। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রশাসনের তরফ থেকে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে হয় না। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। কেউ শহরে থাকতে সাহস পাচ্ছে না গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে। দখল পাল্টাদখলের ময়দানে প্রশাসনের সরকারী দলকে সমর্থন করাই কি একমাত্র কাজ? প্রশাসনের আর কি কিছুই করার নেই? মানুষের জানমালের ও চলাচলের নিরাপত্তা না দিতে পারলে প্রশাসনের কোন প্রয়োজন আছে কি? এ ব্যাপারে কি বলে জেলা কর্তৃপক্ষ? আমরা চাই অবিলম্বে পরিবহন সমস্যা সমাধান হোক। বাস চলাচল করুক। যে কোন ধরনের চাঁদাবাজি বন্ধ হোক। কোটালীপাড়া-রাজৈর সড়কের ভাঙ্গা সেতু অবিলম্বে নির্মাণ করা হোক। বিআরটিসি চালু হোক। আর আইনগত উপায়ে পুলিশের গুলিবর্ষণের ব্যাপারে একটা সুরাহা করা হোক। শান্ত গোপালগঞ্জ যেন আর কখনও অশান্ত না হয়।

এ ঘটনার পর সবার অভিযোগ বিএনপি জেলা শাখার সভাপতি এমএইচ খান মঞ্জুর বিরুদ্ধে। এ ব্যাপারে বিএনপির দলীয় বক্তব্য কি? আর সরকারই বা কি বলবে? তার বিরুদ্ধে যে চাঁদাবাজির অভিযোগ উঠেছে সে চাঁদাবাজিই বা কি? এ ব্যাপারে সরকারের স্পষ্ট করে বলা দরকার। আমি গোপালগঞ্জের মানুষ। তাই আমি জানতে চাই গোপালগঞ্জে এসব হচ্ছেটা কি?

১৪/৮/২০০৪